মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের সমসাময়িক নাট্যকার: জীবন ও শিল্প রূপায়ণে স্বাতন্ত্র্য

> "চিন্তার ক্ষেত্রে নতুন আসে নতুন সত্য নিয়ে, যুক্তির পর যুক্তি দিয়ে পুরাতন সবথেকে খণ্ডিত করে— নতুন সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করেই, শিল্পের ক্ষেত্রে নতুন আসে নতুন জীবনবোধকে রূপে-রসে ব্য করতে করতে, – নতুন জীবন – সমালোচনার প্রবৃত্তি নিয়েই এবং কর্মক্ষেত্রে আসে পুরাতন ব্যবস্থাকে সরিয়ে দিয়ে নতুন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে।"[১]

নাট্য সাহিত্যের এবং নাট্যপ্রয়োগের ক্রমবিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় নাটক এবং নাটকের প্রয়োগ অর্থাৎ উপস্থাপনা রীতি, অভিনয় রীতি প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ সমাজের অগ্রগতির ইতিহাসের সঙ্গে বিশেষ বিশেষ যুগের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, নৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অবস্থার সঙ্গে নিগূঢ়ভাবে যুক্ত। সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জীবন যাপনের রীতির, শ্রেণি বিন্যাসের তথা শ্রেণি সম্পর্কের এবং মূল্যবোধের মধ্যেও পরিবর্তন দেখা দেয়। সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে ব্যক্তি বাসনার এবং বিষয়বস্তু নির্বাচনের একটা নৈমিত্তিক সম্বন্ধ আছে—যুগের পরিবর্তনে লোকের জ্ঞান, প্রেম কর্মে তথা বিষয়বস্তু নির্বাচনে পরিবর্তন দেখা দেয়। বিষয়বস্তুর নির্বাচনে সমাজের দ্বন্দ্বের রূপই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রতিফলিত হয়। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে স্বাধীনতা লাভের সময় পর্যন্ত (১৯৪৭) যত বাংলা নাটক রচিত হয়েছে সেগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তাদের মধ্যে তদানীন্তন বাঙালি জীবনের বিচিত্র দ্বন্দ্বের এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার কথাই ব্যক্ত হয়েছে। বাংলা প্রহসনের ক্ষেত্রে দেখা যায় বাঙালি জীবনের

বিকৃতির দিকগুলি ব্যক্ত করা হয়েছে— উপহাস-ব্যঙ্গের আঘাতে বিকৃতি সংশোধিত করার অভিপ্রায়েই প্রহসনগুলি রচনা করা হয়েছে। পৌরাণিক, ঐতিহাসিক নাটকে বাঙালির এবং ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্য স্মরণ করা হয়েছে এবং তার সাহায্যে জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার কামনাকে উদ্দীপিত করে— জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রধান বাধার ব্রিটিশ আধিপত্যের বিরুদ্ধে পরোক্ষভাবে সংগ্রাম ঘোষণা করা হয়েছে। নাটকে আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিজীবনের পরিবর্তে বৃহত্তর সামাজিক জীবন প্রতিফলিত হয়। শিল্পক্ষেত্রে 'আত্মসংস্কৃতি' মূলত সামাজিক ব্যক্তির রসবোধের – জীবন ও মূল্যবোধের অভিব্যক্তিকেই প্রাধান্য দেয়। এই কারণে প্রত্যেক যুগের সৃষ্টিতে সেই যুগের সমাজের অন্তর্দ্বন্দ্বের ও বহির্দ্বন্দ্বের বিচিত্র রূপ প্রকাশ হয়ে থাকে কোথাও প্রত্যক্ষ কোথাও বা পরোক্ষভাবে। সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে যে দ্বন্দ্ব তাকে সমাজের বহির্দ্বন্দ্ব আর পুঁজিবাদের সঙ্গে যে দ্বন্দ্ব তাকে অন্তর্দ্বন্দ্ব বলা হয়ে থাকে। নাটকের বিষয়বস্তু মূলত বাঙালি জাতির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক দ্বন্দ্ব থেকে নির্বাচিত। বাংলা নাটকের প্রয়োগ ব্যবস্থার ক্রমবিকাশের ইতিহাস অনুসারে বাংলার বাস্তব সংস্কৃতির ইতিহাসের সঙ্গে থিয়েটারের ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে। সাহিত্য সৃষ্টিকে আপাত দৃষ্টিতে শিল্পীর রসবোধের প্রকাশ বলে মনে হলেও আসলে তা শিল্পীর জীবন সমালোচনারই প্রকাশ, তা বিশেষ যুগের রাজনীতিরই সমালোচনা। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য সমাজের মধ্যে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব -যে শ্রেণিদ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল, সাম্য-মৈত্রী- স্বাধীনতাকে বাস্তবে পরিণত করার জন্য যে আবেগ দেখা দিয়েছিল, সেই দ্বন্দ্বের- সেই আবেগের উৎস থেকে বিমুখ থাকেননি শিল্পী সাহিত্যিকগণ। যার ফলে বিভিন্ন শিল্প আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে প্রেক্ষাপটে ঘটেছে নাটকের বিবর্তন। বিবর্তনের পথ ধরে আবির্ভাব ঘটে বিভিন্ন ধারার নাটক ও নাট্যবর্গের। বিশ শতকের চল্লিশ– পঞ্চাশের দশক বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে সন্ধিক্ষণ- ক্রান্তিকালের যুগ বলে বিবেচিত। ষাট-সত্তরের দশক

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতার যুগ। এরকম এক আর্থ-সামাজিক অস্থিরতার যুগে বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে আবির্ভাব ঘটে বিজন ভট্টাচার্য্য, তুলসী লাহিড়ী, বিধায়ক ভট্টাচার্য, সলিল সেন, শম্ভু মিত্র উৎপল দত্ত, বাদল সরকার, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ মিত্র এবং মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের মতো কৃতিমান নট ও নাট্যকারের। সমকাল বা প্রায় সমকালে আবির্ভূত এই সকল নট ও নাট্যকারগণ একই আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের প্রতিনিধি হয়েও প্রত্যেকেই তাদের নাট্যসৃজনকে ভিন্ন ভিন্ন ধারায় চালিত করেছেন। স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করেছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পূর্ববর্তী কালের নাট্যভাবনার সঙ্গে। স্বাতন্ত্র্য শুধু আঙ্গিক ভাবনা, চরিত্র-চিত্রণ, সংলাপ সৃষ্টিতে নয়, স্বাতন্ত্র্য নাট্য মঞ্চায়নের ক্ষেত্রেও। এই সময়কালের নাট্যকারদের হাতেই বাংলা নাটকের যথার্থ মুক্তি ঘটে। তাঁদের হাতেই বাংলা নাটক বিশ্বনাট্যের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করে। এই ধারাতেই মোহিত চট্টোপাধ্যায় তাঁর নাট্য সৃজনের ক্ষেত্রে কিভাবে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছিলেন তা গবেষণার বিষয়। একই সঙ্গে নামকরণ, নাটকের দৃশ্য নির্মাণ, নাট্য- আঙ্গিক, বিষয় ভাবনা, চরিত্র-চিত্রণ ও সংলাপ রচনা সমস্ত দিক থেকেই তিনি স্বতন্ত্র। সমকালীন এই সকল প্রোথিতযশা নাট্যকারদের বিশেষ অবদান ও শৈলীর উল্লেখে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটকে জীবন ও শিল্পের অবস্থান নির্ণয় এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়। মোহিত চট্টপাধ্যায়ের সমকালে বহু খ্যাতনামা নাট্যকুশলীর আবির্ভাব ঘটেছিল যাঁরা তাঁদের অসাধারণ সৃজনীর দ্বারা স্বাধীনতা উত্তর বাংলা নাটকের ধারাকে সমৃদ্ধ করেছেন। এই অধ্যায়ে সেই সকল নাট্যকারদের নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যাঁরা প্রথাগত গতানুগতিক শিল্পাঙ্গনে আবদ্ধ না রেখে তাঁদের নাট্যসৃজনকে স্বতন্ত্র ধারায় চালিত করেছিলেন।

"ভিন্ন রুচির্হি মানবঃ। প্রতিটি মানুষের ভিন্ন ভিন্ন রুচি। এই যে রুচি এ কিন্তু রসজাত। একে বিশুদ্ধ রসায়ন প্রক্রিয়াজাত বোধিবিজ্ঞানও বলা যেতে পারে। কেননা রসে রসে মিলনের ফলেই সুন্দরের জন্ম হয়...।"[২] শিল্পীর সাধনা সুন্দরের সাধনা।

সুন্দরের সাধকেরা সুন্দরকে নানা রূপে বর্ণনা করেছেন, কেউ বলেছেন– 'আনন্দরূপ', কেউ বলেছেন– 'অনির্বচনীয়', আবার কেউ বলেছেন 'অনুপম'। রুচির বিভিন্নতা পেরিয়ে সবশেষে একটি জায়গায় সুন্দর ধরা দেয়। যেমন জীবজগতে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য। "সুন্দর হল আনন্দরূপ। মুণ্ডক উপনিষদের দ্বিতীয় মুণ্ডকের দ্বিতীয় খণ্ডের অষ্টম মন্ত্রে বলা হয়েছে—

মনোময়ঃ প্রাণশরীরনেতা প্রতিষ্ঠিতোঽন্নে হৃদয়ং সন্নিধায়।
তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।।৮

[মনোময় প্রাণ শরীরের নেতা অন্নে প্রতিষ্ঠিত হয়ে হৃদয়ে স্থিত আছেন এই বিজ্ঞান লাভের দ্বারাই ধীমান্ ব্যক্তি তাঁকে পরিপূর্ণ ভাবে দর্শন করে আনন্দরূপ অমৃত বিভা লাভ করেন। অন্তরাননের বিভায় আত্মদর্শনে যে হ্লাদ্ ধৃত হয় তাই আনন্দ, এই আনন্দরূপ অমৃতই 'সুন্দর'।]"[৩]

শিল্পীর আসল কাজ রস সৃষ্টি করা। শিল্পকে যথার্থ শিল্পরূপ লাভ করতে হলে তাকে 'রসনীয়রূপে' পরিণত হতে হবে। কেননা 'ন ভাবহীনোহস্তি রসঃ না ভাবো রসবর্জিত'— অর্থাৎ ভাবহীন রস নেই, রসহীন ভাব নেই। 'বাসনা চ বোধরূপা'–ভাবের সঙ্গে জীবনবোধের নিগূঢ় সম্পর্ক। আর শিল্পসৃষ্টির মূলে আছে প্রয়োজন এবং তার উপযোগিতা।[৪]

> "প্রত্যেক ব্যক্তির মানসিক আচরণে সমাজ পুরুষার্থ এবং ব্যক্তি পুরুষার্থের বুঝাপড়ার রূপটিই বিশেষ আকারে ব্যক্ত হয়ে থাকে। শিল্প রচনা যেহেতু অন্যতম মানসিক আচরণ, শিল্প রচনাতেও ঐ বুঝাপড়ার রূপটিই ব্যক্ত হয়ে থাকে– জগৎ ও জীবন বিষয়ে শিল্পীর যে বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি সেই দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেয়ে থাকে।"[৫]

শিল্পীর এই স্বতন্ত্র বা বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি নির্ণয়ের নিরিখে শৈলীবিজ্ঞান সৃষ্টি হয়েছে। বুঁফো শৈলী সম্পর্কে বলেছেন 'Style is the man himself.' শুধু ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিসত্তা নয়, একই ব্যক্তির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সত্তা অর্থাৎ ভিন্ন আমির অস্তিত্ব অস্বীকার করার নয়। এ প্রসঙ্গে মোহিত চট্টোপাধ্যায় বেশ সুন্দর একটি কথা বলেছেন—

> "মানুষ শুধু রিঅ্যাকশন, রিঅ্যাকশনে মানুষের চরিত্রের প্রকাশ হয়, তার আলাদা কি কোন চরিত্র আছে? আমি আমার ছেলের কাছে যখন থাকি, আমি বাবা। তার পরেই বাবার সঙ্গে যখন কথা বলি তখন আমিই সন্তান, তিনি আমার বাবা। আমার রক্ত মাংসের মধ্যে একটা সন্তান তৈরি হয়ে গেল তখন। তার মধ্যে আগের বাবাকে খুঁজে পাওয়া যায়, আমার সন্তানের কাছে একটু আগে যা ছিলাম। তার পরে আমার স্ত্রীর কাছে আমি যখন যাই তখন আমার ভেতরে ওই বাবা এবং সন্তান কেউ থাকে না— আর একটা চরিত্র এসে দাঁড়ায় তার পর আবার প্রাক্তন কোনো এক মহিলা, একদিন হয়তো ভালবাসতুম, তাঁর সঙ্গে হঠাৎ পথে দেখা, আমার মনটা মেদুর হয়ে আবার কোথায় চলে যায়— তাতে আগেকার কেউ নেই! বন্ধুর কাছে গেলাম বদলে গেলাম। সারাদিন ধরে চলতে চলতে আমি কেবল চরিত্রের পরিবর্তন করতে করতে এগিয়ে যাই। সব মানুষ মুহূর্মুহূ চরিত্রের পরিবর্তন করে যাচ্ছে। রিঅ্যাকশনেই চরিত্র হয়। আমার ছেলের কাছে রিঅ্যাক্ট করি বলেই আমার বাবা চরিত্রটা হয়, আমার বাবার কাছে গেলে রিঅ্যাক্ট করে আলাদা রকম হই— এই রিঅ্যাকশনই হচ্ছে মানুষের চরিত্র। এই রিঅ্যাকশান যত হবে ততই তার চরিত্রের মধ্যে নতুন রূপ আসতে থাকবে। তবু তার মধ্যেও কিন্তু আমরা একটা মূলসূত্র কোথাও

রচনা করি যার জন্য একটা চরিত্র থেকে আর একটা চরিত্রে গেলেও একজন আমাকে চিনতে পারে, বুঝতে পারে— একটা Common Thread তার মধ্যে আছে।"[৬]

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য সমাজের মধ্যে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব– যে শ্রেণিদ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল, সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতাকে বাস্তবে পরিণত করার জন্য যে আবেগ দেখা দিয়েছিল, সেই দ্বন্দ্ব-আবেগের উৎস থেকে বিমুখ থাকেননি শিল্পী সাহিত্যিকগণ। যার ফলে সূত্রপাত ঘটে বিভিন্ন শিল্প আন্দোলনের। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর দেশকালের প্রেক্ষাপটে ঘটেছে নাটকের বিবর্তন। এই বিবর্তন পথ ধরে আবির্ভাব ঘটে বিভিন্ন ধারার নাটক ও নাট্যবর্গের। বিশ শতকের চল্লিশ–পঞ্চাশের দশক বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে সন্ধিক্ষণ–ক্রান্তিকালে বলে বিবেচিত। ষাট-সত্তরের দশকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতার যুগ। এরকম এক আর্থ-সামাজিক অস্থিরতার যুগে বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে মৌলিক নাটকের মন্দা অবস্থা চলেছিল। এরকম এক সঙ্কটজনক অবস্থা থেকে বাংলা নাটককে স্বচ্ছন্দ গতিতে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন বিজন ভট্টাচার্য, তুলসী লাহিড়ী, সলিল সেন, শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাদল সরকার, মোহিত চট্টোপাধ্যায় ও মনোজ মিত্র প্রমুখ কৃতিমান নট ও নাটককাররা। সমকাল বা প্রায় সমকালে আবির্ভূত এই সকল নট ও নাটককারগণ একই সমাজের প্রতিনিধি হয়েও প্রত্যেকে তাঁদের নাট্যসৃজনকে ভিন্ন ভিন্ন ধারায় চালিত করেছেন। স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করেছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পূর্ববর্তী কালে নাট্যভাবনা সঙ্গে। স্বাতন্ত্র্য শুধু আঙ্গিক ভাবনা, চরিত্র-চিত্রণ, সংলাপ সৃষ্টিতে নয়, স্বাতন্ত্র্য মঞ্চায়নের ক্ষেত্রেও। এই সময়কালের নাট্যকারদের হাতেই বাংলা নাটকের যথার্থ মুক্তি ঘটে। তাঁদের হাতেই বাংলা নাটক বিশ্বনাট্যের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে বাংলা নাটকের জগতে আবির্ভাব বিজন ভট্টাচার্যের। বিজন ভট্টাচার্য (জন্ম - জুলাই ১৭, ১৯১৭ ফরিদপুর, বাংলাদেশ; মৃত্যু - ১৯ জানুয়ারি, ১৯৭৮) একজন বাঙালি নাট্যমঞ্চের খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব ও সুঅভিনেতা। বিজন ভট্টাচার্য ফরিদপুর জেলার খানাপুরে ১৯১৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ক্ষীরোদবিহারী ভট্টাচার্য ছিলেন একজন স্কুলশিক্ষক। ভূস্বামী পরিবারে তাঁর জন্ম। পিতার কর্মসূত্রে বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস করার সুবাদে তিনি সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হন।

বিজন ভট্টাচার্যের নাট্যজীবনের শুরু হয় ১৯৪০ এর দশকে। বাংলা নাটকের এক বন্ধ্যাদশায় তিনি নাটক রচনায় বাংলা নাট্যসৃজনে আত্ম নিয়োগ করেন। তখন নতুন নাত্যচেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে পেশদার রঙ্গমঞ্চগুলি। প্রচলিত বাণিজ্যিক থিয়েটারের ধারার বাইরে স্বতন্ত্র নাট্য আন্দোলনের সূচনা করেন কিছু ফ্যাসিবাদ বিরোধী লেখক শিল্পী গোষ্ঠী । এঁদেরই সাংস্কৃতিক শাখা ছিল ভারতীয় গণনাট্য সংঘ বা ইন্ডিয়ান পিপলস থিয়েটার অ্যাসোসিয়েসন যা আই পি টি এ নামে বেশি পরিচিত। বিজন ভট্টাচার্য ছিলেন এই গণনাট্য সঙ্ঘের প্রথম সারির নাট্যকর্মী। চিন্তা, চেতনা এবং সংগ্রামের প্রগতিশীল চিন্তা ভাবনার দিশারী ছিল ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ। বিজন ভট্টাচার্যের নাটক রচনা, অভিনয় এবং নির্দেশনা সাফল্য লাভ করেছিল এই গণনাট্য আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। গণনাট্যের প্রয়োজনেই তাঁর নাটক রচনায় আত্মনিয়োগ। তিনি প্রায় চৌদ্দটি পূর্ণাঙ্গ নাটক নয়টি একাঙ্ক নাটক ও একটি গীতিনাট্য ও রূপক নাট্য রচনা করেন। গণনাট্য সঙ্ঘের (সেই সময় ফ্যাসিবিরোধী লেখক শিল্পী সঙ্ঘ) প্রথম নাটক ‘আগুন’ বিজন ভট্টাচার্যের রচনা । এই নাটকটি ১৯৪৩ সালে মঞ্চস্থ হয়েছিল। ১৯৪৪ সালে তাঁর লেখা নাটক ‘জবানবন্দী’ এবং ‘নবান্ন’ অভিনীত হয়েছিল। এই নাটকগুলিতে তিনি প্রধান অভিনেতা এবং নির্দেশকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ১৯৪৪ সালের ২৪ অক্টোবর শ্রীরঙ্গম মঞ্চে ‘নবান্নে’র প্রথম অভিনয় হয়।

এই নাটকটির পটভূমিকা ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অস্থিরতা, ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলন, পঞ্চাশের মন্বন্তর এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ। গণনাট্য আন্দোলন এবং বিজন ভট্টাচার্যের নাটক বাংলা নাটক রচনা এবং অভিনয়ের এক যুগবদলের সূচনা করে।

১৯৪৮ সাল থেকে গণনাট্য সঙ্ঘের সঙ্গে বিজন ভট্টাচার্যের মতান্তর ঘটে। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫০ তিনি বোম্বাইতে হিন্দি সিনেমার সঙ্গে যুক্ত থাকেন। ১৯৫০ সালে তিনি আবার বাংলায় ফিরে আসেন এবং নিজের নাটকের দল ক্যালকাটা থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। এখানেও তিনি নাট্যকার, প্রধান অভিনেতা এবং নির্দেশকের ভূমিকা পালন করেন। এই থিয়েটারে তাঁর রচিত নাটকের মধ্যে অন্যতম ছিল কলঙ্ক, গোত্রান্তর, মরাচাঁদ, দেবী গর্জন, গর্ভবতী জননী প্রভৃতি। ১৯৭০ সালে তিনি ক্যালকাটা থিয়েটার ছেড়ে দিয়ে কবচ-কুণ্ডল নামে নতুন দল গঠন করেন। এখানে তাঁর রচিত নাটকগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল কৃষ্ণপক্ষ, আজবসন্ত, চলো সাগরে, লাস ঘুইরা যাউক প্রভৃতি। বিখ্যাত লেখিকা জ্ঞানপীঠ পুরস্কার বিজয়ী মহাশ্বেতা দেবী বিজন ভট্টাচার্যের স্ত্রী। তবে পরবর্তীকালে তাঁরা বিবাহ বিচ্ছিন্ন হন। তাঁদের এক সন্তান নবারুণ ভট্টাচার্য যিনি ১৯৪৮ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। নবারুণ ভট্টাচার্য একজন সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার প্রাপ্ত লেখক এবং কবি।

বিজন ভট্টাচার্য মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন। কৃষক শ্রমিক মেহনতী মানুষের জীবন সংগ্রামের কথা ও বাঁচবার কথা তাঁর নাটকগুলির মুখ্য বিষয় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আস্তে আস্তে তিনি এই ভাবনা থেকে সরে যান। গণনাট্য সঙ্ঘ ত্যাগ এবং নিজের নাটকের দল একাধিক বার ভেঙে গড়ে তিনি তৈরি করেন। ক্রমে মার্কসীয় দর্শনের পরিবর্তে তাঁর রচনায় লোকায়ত ধর্ম দর্শন, হিন্দু ধর্মের সমন্বয় প্রয়াসী মানসিকতা কাজ করেছিল। চিরকালীন মাতৃকা ভাবনা তাঁর নাটকে প্রায়ই লক্ষ করা যায়। অভিনেতা হিসাবে বিজন ভট্টাচার্য অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। নানারকম চরিত্রকে

মূর্ত করে তুলতে তিনি দক্ষ ছিলেন । নানা উপভাষার সংলাপ উচ্চারণেও তিনি সাফল্য অর্জন করেছিলেন। তাঁর অভিনীত উল্লেখযোগ্য চরিত্রের মধ্যে ছিল বেন্দা (জবানবন্দী), প্রধান সমাদ্দার (নবান্ন), পবন ও কেতকাদাস (মরাচাঁদ), হরেন মাস্টার (গোত্রান্তর), প্রভঞ্জন (দেবীগর্জন), মামা (গর্ভবতী জননী), কেদার (আজ বসন্ত), সুরেন ডাক্তার (চলো সাগরে) প্রভৃতি। নাট্যনির্দেশক হিসাবেও তিনি সমান সফল ছিলেন। গণনাট্য সঙ্ঘে তাঁর নাটক জবানবন্দী এবং নবান্ন ছিল অসাধারণ দুটি প্রযোজনা। পরে তিনি তাঁর নিজের গ্রুপ থিয়েটারেও বহু নাটকের সফল প্রযোজক এবং নির্দেশক ছিলেন। আগুন(১৯৪৩), জবানবন্দী (১৯৪৩), নবান্ন (১৯৪৪), জীয়নকন্যা (১৯৪৫), মরাচাঁদ (১৯৪৬), অবরোধ(১৯৪৭), কলঙ্ক(১৯৫০), জননেতা(১৯৫০), জতুগৃহ(১৯৫২), মাস্টারমশাই(১৯৬১), গোত্রান্তর (১৯৬১), ছায়াপথ (১৯৬১), দেবীগর্জন (১৯৬৬), কৃষ্ণপক্ষ (১৯৬৬), ধর্মগোলা (১৯৬৭), গর্ভবতী জননী (১৯৬৯), আজ বসন্ত (১৯৭০), লাস ঘুইর‍্যা যাউক (১৯৭০), স্বর্ণকুম্ভ(১৯৭০), চলো সাগরে (১৯৭২), চুল্লি(১৯৭৪), হাঁসখালির হাঁস (১৯৭৬) ইত্যাদি তাঁর নাট্যকর্ম।

বিজন ভট্টাচার্য ১৯ জানুয়ারি, ১৯৭৮ সালে কলকাতায় মারা যান। তিনি এমন এক সময় বাংলা নাটক রচনায় আত্মনিয়োগ করেন যখন বাংলা নাটকে বন্ধ্যাদশা চলছিল এবং পেশাদারী রঙ্গমঞ্চগুলি নতুন নাট্য চেতনায় উদ্বুদ্ধ হবার বাসনা হারিয়ে ফেলেছিল। সে সময় যেসব ঐতিহাসিক ধর্মমূলক পৌরাণিক, সামাজিক নাটক রচনা হচ্ছিল তাতে সমকালের স্বরূপ সঠিকভাবে উদ্ঘাটিত হচ্ছিল না। তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন বিভিন্ন রাজনৈতিক অভিঘাত ও আন্দোলন। তাঁর নাটকে নিপীড়িত মানুষের সমবেত শ্রেণিসংগ্রামের ইতিহাস লিপিবদ্ধ। তিনি ছিলেন গণনাট্য সংঘের পথপ্রদর্শক। তাঁর নাট্যসৃজন সম্পর্কে সমালোচকের মত –

" নট ও নাট্য পরিচালক বিজনের পরিপূর্ণ পরিচয় তাঁর নাট্য রচনার মধ্যেই ব্যক্ত হয়েছে। তিনি নিপীড়িত মানুষের নাট্যরূপকার। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, আগস্ট আন্দোলন, দাঙ্গা, দেশভাগ, মার্কসবাদী আন্দোলন এবং তার স্ববিরোধী প্রকৃতি, পেটি বুর্জোয়া নেতার বামপন্থী ভণ্ডামি, অতিবিপ্লবী বামপন্থী রাজনীতির ভয়াবহতা সবই বিজন প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাঁর নাট্য সমগ্র তারই প্রতিরূপ। তাঁর নাট্যবীক্ষা তাঁর জীবনবীক্ষার প্রতিফলন ঘটিয়েছে। এই প্রতিফলনে তিনি যত অকপট থেকেছেন ততই তিনি শিকার হয়েছেন হতাশা ও বিভ্রান্তির। ..."[৭]

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে সর্বাত্মক আলোড়নের ঢেউ লাগে বাঙালি মননে। তৃতীয় দশকে দেখা দেয় মানবজীবন সম্পর্কে প্রশ্ন-সংশয়-জিজ্ঞাসার সূত্রাপ্ত ঘটে। চারের দশকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সর্বগ্রাসী প্রতিক্রিয়া মানুষের জীবনবোধের, বিশ্বাসের ভিত্তিমূলকে নাড়িয়ে দেয়। যুদ্ধ, মন্বন্তর, দেশবিভাগ মানুষের জীবনে গভীর বিপর্যয় নিয়ে আসে- এরকমই এক ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ পটভূমিতে তুলসী লাহিড়ীর আবির্ভাব ঘটে । প্রখ্যাত নট, নাট্যকার, পরিচালক ও গীতিকার তুলসী লাহিড়ী (১৮৯৭ – ১৯৫৯) বাংলা নাটক ও অভিনয়ের জগতে একটি বিশিষ্ট ও স্মরণীয় নাম। জন্ম রংপুরের নলডাঙার জমিদার পরিবারে। তাঁর নিজস্ব শিক্ষাদীক্ষা, পারিবারিক সংস্কৃতি, তাঁর আইনজ্ঞান, রংপুরে সেই সময়কার নাট্যসংস্কৃতি, জমিদারের ছেলে হয়েও কৃষিজীবন ও সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও পঞ্চাশের মন্বন্তরের রূঢ় অভিঘাত এবং সর্বোপরি মূল্যবোধে দৃঢ়বিশ্বাস তাঁর শিল্পী মানসকে প্রভাবিত করেছিল। সংগীতের মাধ্যমে তাঁর নাট্যজগতে প্রবেশ। যেখানেই তিনি বিশেষ কোনো আদর্শের কথা বলেছেন (যেমন 'ছেঁড়া তার', 'বাংলার মাটি') সেখানেই রবীন্দ্রনাথের গান-কবিতার উদ্ধৃতি যেন তাঁর নাটকের আবশ্যিক অঙ্গ হয়ে গেছে।

১৯২৯ সালে উস্তাদ জমিরুদ্দিন খাঁকে দিয়ে স্বরচিত দু'টি গান গ্রামাফোন কোম্পানি অফ ইন্ডিয়া (হিজ মাস্টার্স ভয়েস) থেকে রেকর্ড করান তুলসী লাহিড়ী। এরপর থেকেই শুরু হয় তাঁর সুরকার, গীতিকার, পরিচালক ও অভিনেতার জীবন। নাট্যকাররূপে তিনি প্রগতিশীল নাট্যধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। প্রথম সুর সংযোজনা করেন আর্ট থিয়েটারের 'স্বয়ম্বরা' (১৯৩১) নাটকে। প্রথম অভিনয় করেন রবীন্দ্র-নাটক 'চিরকুমার সভা'র চন্দ্রবাবুর চরিত্রে। এছাড়া সুর দেন 'পোষ্যপুত্র', 'মন্দির' প্রভৃতি নাটকে। 'যমুনা পুলিনে' নামে একটি চলচ্চিত্রও পরিচালনা করেন।

১৯৪৬ সালে শ্রীরঙ্গম থিয়েটারে তাঁর প্রথম নাটক 'দুঃখীর ইমান' অভিনীত হয়। ১৯৪৭ সালের মে-জুন নাগাদ নাটকটি বই আকারে প্রকাশিত হয়। বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' ও তুলসী লাহিড়ীর 'দুঃখীর ইমান' সমসাময়িক দু'টি রচনা। কিন্তু আদর্শগত কারণে গণনাট্য সংঘ এই নাটকটি মঞ্চস্থ করেনি। এটি মঞ্চস্থ হয়েছিল পেশাদার নাট্যমঞ্চে। তাত্ত্বিক দিক থেকে তুলসী লাহিড়ী কমিউনিস্ট ছিলেন না। তিনি মানবতাবাদী একটি বিশেষ আদর্শে বিশ্বাস করতেন। যুগের প্রভাবে কৃষক শ্রেণির দুঃখ-বেদনা-বিশ্বাসের দিকটি তিনি ফুটিয়ে তুলেছিলেন তাঁর নাটকে। সুধী প্রধান মনে করেন বিজন ভট্টাচার্য মার্ক্সবাদ পড়ে যা করতে পারেনি – তুলসী লাহিড়ী না পড়ে তাই করেছেন। সেই কারণেই হয়ত শিল্পবাদী এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে শোধনবাদী শম্ভু মিত্রের 'বহুরূপী' দলে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। অবস্থানের দিক থেকে তাই তাঁকে গণনাট্য অপেক্ষা নবনাট্য দলের একজন বলতে হয়। ১৯৪৯ সালের ১৬ অক্টোবর তুলসী লাহিড়ীর 'পথিক' নাটকের মাধ্যমেই বহুরূপীর যাত্রা শুরু হয়। এই নাটকে কয়লাখনির সাধারণ মজুরদের ধ্বংসের নিচে চাপা পড়ার কাহিনিকে পটভূমি করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার কালোবাজারি ও ডাকাত দলের বিরুদ্ধে এক আদর্শবাদী ভবঘুরেকে জাহির করেছেন তিনি – এই লোকটি কোনো দলের লোক নয়, অথচ সত্যের জন্য প্রাণ দিতে পারে।

১৯৫০ সালের ১৭ ডিসেম্বর নিউ এম্পায়ার থিয়েটারে বহুরূপীর প্রযোজনায় তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়া তার' নাটকটি অভিনীত হয়। কৃষক জীবনের সাধারণ সমস্যার সঙ্গে মুসলিম সমাজের তালাকের সমস্যা তিনি যেভাবে এই নাটকে উত্থাপন করেছেন, বাংলা সাহিত্যে তার তুলনা নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও বলতে হয়, যে শ্রেণিসংগ্রামের মধ্যে দিয়ে 'ছেঁড়া তার' নাটকের সূচনা, সেই শ্রেণিসংগ্রামই নাটকে পরে গৌন হয়ে গেছে। একটি বিশেষ মূল্যবোধ, আদর্শবাদ ও ভাববাদী মনোভাব তুলসী লাহিড়ীকে বিশেষভাবে পরিচালিত করেছিল। এই নাটকে তিনি নিজে হাকিমুদ্দি চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন।

১৯৫৩ সালে বহুরূপী ছেড়ে বেরিয়ে আসার পর প্রথমে 'আনন্দম্' ও পরে 'রূপকার' নামে নিজস্ব নাট্যদল গড়ে তোলেন। ঐ বছরই ৩ অক্টোবর 'ক্রান্তিশিল্পী সংঘ'র মণ্ডপে তাঁর 'বাংলার মাটি' অভিনীত হয়। এই নাটকটি ছিল হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার একটি প্রয়াস। নাটকের শেষে ব্যবহৃত হয় বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথের লেখা 'বাংলার মাটি, বাংলার জল' গানটি দিয়ে। এই নাটকে আবু মিঞা ছিলেন নাট্যকারের মুখপাত্র। দার্শনিক আদর্শে বিশ্বাসী এই চরিত্রটির কণ্ঠে ব্যবহৃত হয়েছিল আর একটি রবীন্দ্রগান – 'বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমনি শক্তিমান'।এরপর তুলসী লাহিড়ী লেখেন 'ঝড়ের নিশান' ও 'লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার'। আবু মিঞার মতো লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার নাটকে সমাজকর্মী এক দুঃস্থ নারীকে বলেছে 'দুঃখের পোড়-খাওয়া সব দুঃখীর দল তোমার পাশে আছে।'

তুলসী লাহিড়ীর একাঙ্ক নাটক 'নাট্যকার' ১৯৫৬ সালে গণনাট্য সংঘ কর্তৃক অভিনীত হয়েছিল। এই নাটকে নাট্যকার নিজে মুখ্য চরিত্র কমলবাবুর চরিত্রে অভিনয় করেন। এখানে আমরা নাট্যকারকে বলতে শুনি, যারা লোভে নানা কুকর্ম করে, তারা

মনুষ্যত্বের চরম শত্রু। ১৯৬১ সালে তাঁর 'নাট্যকারের ধর্ম' প্রবন্ধটি গণনাট্য সংঘের রাজ্যোৎসব উপলক্ষ্য প্রকাশিত স্মরণিকায় প্রকাশিত হয়।

গণনাট্য সংঘের নাট্যরচনা ও প্রযোজনার নিয়মনীতি তুলসী লাহিড়ী কিছুটা অনুসরণ করলেও ভাববাদ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করতে পারেননি। 'ছেঁড়া তার' নাটকে হাকিমুদ্দিনের সাজা হয়ত শোষক পক্ষের পরাজয়ের প্রত্যক্ষ প্রমাণ, কিন্তু নাট্যকারের মূল লক্ষ্য ছিল রহিমের ট্রাজেডি তুলে ধরা। তাই তুলসী লাহিড়ী নাট্যকার রূপে প্রগতিশীল ভাবধারার অনুসারী হয়েও শেষ বিচারে তিনি ভাববাদী, আদর্শবাদী ও শিল্পবাদী। যে ভাববাদী আশা ও আদর্শবাদ তাঁর নাটকের প্রধান সুর।

তুলসী লাহিড়ী একইসঙ্গে সুরকার, গীতিকার, অভিনেতা ও নাট্যকার হিসেবে বাংলা নাটক জগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি গণনাট্য সংঘে যোগ দিলেও পরবর্তীকালে গণনাট্য সংঘ থেকে বেরিয়ে এসে নতুন নাট্যগোষ্ঠী গড়ে তোলেন। তাঁর চিন্তাধারা ছিল শোষিত, নির্যাতিত মানুষের জীবননাট্য রচনা করা। তাঁর জীবন দৃষ্টি সমাজতান্ত্রিক ভাবনায় উদ্বুদ্ধ। সমাজের শোষক, অত্যাচারী বিবেকহীন মানুষের বিরুদ্ধে তিনি গর্জে উঠেছিলেন। সাধারণ মানুষের প্রতি দরদ ও সহানুভূতি তাঁকে ভাবপ্রবণ করে তুলেছিল। কৃষক, মজুর, নিম্ন-মধ্যবিত্ত কুলি, কামিন, সাঁওতাল, দালাল এই সমস্ত চরিত্র তাঁর নাটকে বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে। তিনি দেখিয়েছেন বেঁচে থাকার তাগিদে সংঘবদ্ধ হওয়ার কথা। তাঁর সৃজনশিল্প সম্পর্কে বলা যায় –

> "তুলসী লাহিড়ী যুগন্ধর শিল্পী। যুগের অস্থিরতা, সংশয়, জিজ্ঞাসা তাঁর শিল্পে বাঙ্ময় রূপ লাভ পেয়েছে। যুদ্ধের বিভীষিকা ও তার তীব্র প্রতিক্রিয়া, মন্বন্তরের কুৎসিত বিপর্যয়, দেশ বিভাগোত্তর বাঙালী জীবনের অর্থনীতি-সামাজিক-নৈতিক মূল্যবোধের বিক্রিয়াজনিত পরিবর্তন, দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজের রূপ ও

রূপান্তর তাঁর নাট্যশিল্পে মূর্ত হয়ে উঠেছে। ... জীবনের উপরিতলে ভাসমান ফেনপুঞ্জের বর্ণচ্ছটায় মুগ্ধ হয়ে সেখানেই তিনি মত্ত থাকেননি, জীবনের গভীরে অন্তঃসারী মনের সন্ধানে তাঁর শিল্প মানস সতত চেষ্টিত। ... তাঁর প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য মানুষ, অর্থে সমাজনীতিক ও আত্মিক সম্পদে পূর্ণ পরিপূর্ণ মানুষ। এই সাধনার কারণেই তিনি বর্তমানের ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি অঙ্গুলি নিরদেশ করেছেন, শ্লেষ-বিদ্রূপের নির্মম কষাঘাত করেছেন, অন্যদিকে মানুষের প্রতি পরম বিশ্বাসে ও উদ্বেল হয়ে উঠেছেন। ... অপরাজেয় মানবাত্মার অপরিমাণ সত্যের উদ্ঘাটনে মানুষ একদিন সব ব্যর্থতা, গ্লানি, অন্ধকার থেকে উদার জ্যোতির্ময়লোকে উত্তরণ করবেই- এ বিশ্বাস তিনি রাখেন। তিনি বিশ্বাস করেন- 'It is not the historian, but the artist, who writes the real history of man'।"[৮]

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৯০) চল্লিশের দশকের এমন এক সময় নাটক রচনায় আত্মনিয়োগ করেন, তখন সমাজ ব্যবস্থার অভ্যন্তরে মানবতা বিরোধী মনোভাব প্রবল আকার ধারণ করে। এই পরিস্থিতিকে তিনি তীক্ষ্ণ নজরে পর্যবেক্ষণ করে মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে অনুধাবন করতে চেয়েছিলেন। তাঁর নাটকের মধ্যে সমাজচিন্তা, অর্থনৈতিক ভাবনা সেই সঙ্গে সংকট অতিক্রমের ইতিবাচক মনোভাব লক্ষ করা যায়। দেশের প্রচলিত জীবনধারার গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে সচেতনতা তাঁর নাটকে প্রাধান্য পেয়েছে। জীবন ঘনিষ্ঠ বস্তুবাদী চেতনায় মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি যাবতীয় পারিবারিক ও সামাজিক পরিস্থিতির বিবেচনা করেছেন। ১৯৪৩ সালে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের একজন সক্রিয় নাট্যকর্মী ছিলেন।

স্বাধীনতা উত্তর বাংলা নাট্যসাহিত্যের একজন উল্লেখযোগ্য নাট্যকার হলেন সলিল সেন (১৯২৪-১৯৯৯)। তাঁর নাটকে বিধ্বস্ত মানবসমাজ প্রাধান্য পেয়েছে। তিনি জীবনের বাস্তবতার দিককে তাঁর রচনায় সূক্ষ্ম চিন্তা-চেতনায় প্রতিবিম্বিত করেছেন। তিনি তাঁর সমসাময়িক উদ্বাস্তু সমস্যাকে কেন্দ্র করে 'নতুন ইহুদী' নাটকটি রচনা করেছেন। তাঁর নাটক বিচিত্র মানুষের ভিড় এইসব মানুষের বৈশিষ্ট্য জীবিকার সন্ধান ও জীবনযাপন প্রণালী বৈচিত্র্যে ভরা তাঁর নাট্য কাহিনি।

নাটক যে শুধুমাত্র বিনোদনের মাধ্যম নয় রাজনৈতিক চেতনা বিকাশের হাতিয়ার এবং শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অন্যতম মাধ্যম - এ উপলব্ধি উৎপল দত্তের নাট্য চেতনায় স্পষ্ট। মার্কসবাদী চিন্তা ধারায় উদ্বুদ্ধ নাট্যকার উৎপল দত্ত চেয়েছিলেন দর্শক ও থিয়েটারের সঙ্গে সংযোগ গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে জনচেতনা জাগাতে। উৎপল দত্ত তাঁর নাটকে দেখিয়েছেন মানুষের মুক্তির লড়াইয়ের কাহিনি। মানুষের মুক্তি যেখানে অবরুদ্ধ হয়েছে মুক্তিকামী মানুষের সংঘবদ্ধভাবে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। তাই তাঁর নাটকে বার বার ফিরে এসেছে সামন্ততন্ত্র, রাজতন্ত্র, পুঁজিবাদ সাম্প্রদায়িক চেতনা এবং কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ। থিয়েটার সম্প্রদায় ছাড়াও, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে থিয়েটারে উৎপল দত্তের অবদানের বিষয়ে সচেতন ব্যক্তিদের মধ্যে এমন অনেক লোক নেই। বস্তুত, তিনি প্রথম থিয়েটারের একজন এবং পরবর্তীতে সিনেমার একজন মানুষ ছিলেন এবং তিনি চলচ্চিত্রের মাধ্যমে যা অর্জন করেছিলেন তা তিনি থিয়েটারের কারণকে তুলে ধরার জন্য স্থাপন করেন।

তাঁর ২০তম মৃত্যুবার্ষিকী ১৯ আগস্ট ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। এটি থিয়েটারের কারণেই উৎপল দত্তের স্মৃতিস্তম্ভের পুনরাবৃত্তির জন্য একটি যথার্থ সময়। উৎপল দত্ত জনগণকে শিক্ষিত করার জন্য থিয়েটার হিসেবে ব্যবহার করেন এবং যখন তিনি বেঁচে ছিলেন তখন মার্কসবাদীদের পক্ষে কোনও রাজনৈতিক সমাবেশে

অভিনীত ৩০ মিনিটের পথ নাটকগুলি ছাড়া সম্পূর্ণ কোনো নাটক ছিল না। তিনি তাঁর থিয়েটারকে বিপ্লবের একটি থিয়েটার বলে মনে করেন। যদিও উৎপল দত্ত বার্টোল্ট ব্রেখট থেকে এপিক থিয়েটারের ধারণা লাভ করেন। তবে এপিক থিয়েটারের রচনাটি ব্রেখটের সাথে ভাবগত দিক থেকে ভিন্ন ছিল। কানাডায় অবস্থিত একজন সমাজবিজ্ঞানী ও লেখক হিমানী ব্যানারজি সুস্পষ্টভাবে দুটি পন্থাগুলির মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরেছেন। স্ট্যানিস্লাভস্কি, তাঁর পৌরাণিক কাহিনিগুলির পুনর্জীবিত শক্তিগুলির উপর ভিত্তি করে এপিক থিয়েটার গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। উৎপল দত্ত কলকাতায় সেন্ট জাভিয়েরের কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভের পর, তিনি দ্য শেক্সপীয়ার্স নামে একটি গ্রুপ গঠন করেন। এই গ্রুপ দ্বারা পরিচালিত প্রথম নাটক ছিল 'রিচার্ড তৃতীয়'। জেরফ্রে এবং লরা কেন্ডল অভিনয় এতটাই প্রভাব বিস্তার করেছিলেন যে, তাঁরা উৎপল দত্তকে তাদের শেকসপিরিয়ান থিয়েটার কোম্পানীতে নিয়ে গিয়েছিল। দুই বছর ধরে ক্রমানুসারে উৎপল দত্ত শেক্সপীয়ারের নাটকগুলি থেকে বিভিন্ন ভূমিকা পালন করেন এবং সমস্ত ভারত ও পাকিস্তান জুড়ে কাজ করেন। তিনি লিটল থিয়েটার গ্রুপ গঠন করে স্থানীয় ভাষাতে কাজ শুরু করার সিদ্ধান্ত নেন।

শেক্সপীয়ার এবং অন্যান্য রাশিয়ান আধুনিকতার অনুবাদ তাঁর বাঙালি ভাষায় এখনও প্রচলিত আছে বাংলায় থিয়েটারের ভক্তরা। উৎপল দত্ত নিজেকে কেবলমাত্র একটি থিয়েটার গ্রুপ গঠন করার জন্য সীমিত করেনি। তিনি অন্যান্য দল গঠন করেন, যথা পিপলস থিয়েটার গ্রুপ, আর্য অপেরা এবং বিবেক নাট্সমাজ। অন্যান্য ভাষাগুলির সাহিত্যিক কাজ সম্পর্কে তাঁর বোধগম্যতাকে গভীর করে তোলার জন্য এবং তাদের স্থানীয় ভাষা বাংলায় অনুবাদ করতে সক্ষম হওয়ার জন্য, উৎপল দত্ত নিজেকে স্প্যানিশ, জার্মান, ফরাসি এবং ল্যাটিন ভাষা শেখায়। এদিকে, তিনি কলকাতায় সাউথ পয়েন্ট স্কুলে ইংরেজী পড়াশোনা চালিয়ে যান এবং এমনকি তিনি বিখ্যাত হয়ে ওঠার পরও তা করেন।

উৎপল দত্তের লিটল থিয়েটার একটি প্ল্যাটফর্ম যা দমনমূলক বাহিনীর বিরুদ্ধে নিপীড়িত দলের সংগ্রামের ফাঁস হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইউরোপীয় ও ভারতীয় সংস্কৃতির ঘিরে গড়ে ওঠা, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি ছিল যা ঔপনিবেশিকতার সাথে জড়িত অনেক পুরাণকে ধ্বংস করেছিল। উৎপল দত্ত উপনিবেশবাদকে সবচেয়ে খারাপ ধরনের শোষণ হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন এবং তাঁর থিয়েটারের মাধ্যমে তিনি বুর্জোয়াদের এবং ইতিহাসের অন্যান্য বিকৃত সংস্করণকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন।

তিনি যাত্রা পালাকে পুনরুজ্জীবিত করতেও সহায়ক ছিলেন। তিনি বাংলার গ্রামগুলিতে গ্রামীণ জনসাধারণের মধ্যে বামপন্থী মতাদর্শ ও বিশ্বাসের প্রকাশের একটি কার্যকরী পদ্ধতিতে যাত্রার প্ল্যাটফর্মের ওপর জোর দেন। তিনি নিজের যাত্রা সংগঠন করেন এবং বাইশটি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের নাটক, পনেরটি পথ নাটক এবং উনিশটি যাত্রা স্ক্রিপ্ট রচনা করেন।

কলকাতার মিনার্ভা থিয়েটার ছিল তাঁর প্রধান বক্তব্যস্থল। ১৯৫৯ সালে তিনি থিয়েটারে লিজ গ্রহণ করেন। জনগণের সমস্যা নিয়ে তাঁর সহযোগিতার শুরু হয় অঙ্গার (ফায়ার) নামে একটি নাটক যা ১৯৫৯ সালে কয়লা খনি শ্রমিকদের শোষণের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল। কল্পনাপ্রবণ লাইট, সাউণ্ড, ভিসুয়াল ব্যায়াম, সঙ্গীত, তীব্র অভিনয় এবং মৃদু অভিনেতাদের সঙ্গে ভর্ৎসনা করার পরিস্থিতিতে চিত্রিত। মিনার্ভা এইভাবে পরবর্তী দশকে তাঁর কর্মজীবনের আধার হয়ে ওঠে। উৎপল দত্তের নাট্যকৃতি সম্পর্কে ড. অজিত কুমার ঘোষ লিখেছেন-

> "বর্তমান কালের নাট্যাভিনয় ও নাট্যপ্রযোজনার ক্ষেত্রে উৎপল দত্তের স্থান প্রথম শ্রেণিতে এ বিষয়ে সম্ভবত বিশেষ মতভেদ হইবে না। ... পরিবেশের পুঙ্খানপুঙ্খ বাস্তবতা এবং চরিত্রের রূক্ষ ও রূঢ় রূপের যথাযথ বর্ণনায় তাঁহার নাট্য বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট

হইয়াছে। তাঁহার সংলাপ অতি তীক্ষ্ণ ও অনাবৃত এবং পরিবেশ ও চরিত্ররূপের সহিত অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কযুক্ত। উৎপলবাবু দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে অত্যন্ত উগ্রভাবে বিশ্বাসী এবং নাটকের মধ্যে তিনি অতি স্পষ্টভাবেই নিজের মত প্রচার করিতে আগ্রহী। জীবনের কোমল, সুন্দর ও প্রীতিস্নিগ্ধ রূপের প্রতি তাঁহার কোন আস্থা নাই। ...উৎপবাবুর 'ফেরারী ফৌজে' যথার্থ শিল্পীর সমদর্শী ও সহানুভূতিমূলক দৃষ্টি দেখা যায়। এই নাটকে সর্বপ্রথম মানবীয় হৃদয়বৃত্তির মূল্য ও দ্বন্দ্বজটিল জীবনের রস তাঁহার স্বীকৃতি লাভ করিল।"[৯]

শম্ভু মিত্র (২২ অগস্ট, ১৯১৫ – ১৯ মে, ১৯৯৭) ছিলেন বাংলা তথা ভারতীয় নাট্যজগতের এক কিংবদন্তি ব্যক্তিত্ব, স্বনামধন্য আবৃত্তিশিল্পী ও চলচ্চিত্র অভিনেতা। ১৯৩৯ সালে বাণিজ্যিক নাট্যমঞ্চে যোগ দেন। পরে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সদস্য হন। ১৯৪৮ সালে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে গড়ে তোলেন নাট্যসংস্থা বহুরূপী। ১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বহুরূপীর প্রযোজনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সফোক্লিস, হেনরিক ইবসেন, তুলসী লাহিড়ী এবং অন্যান্য বিশিষ্ট নাট্যকারের রচনা তাঁর পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয়। শম্ভু মিত্রের স্ত্রী তৃপ্তি মিত্র ও কন্যা শাঁওলী মিত্রও স্বনামধন্য মঞ্চাভিনেত্রী। শাঁওলি মিত্রের নাট্যসংস্থা পঞ্চম বৈদিকের সঙ্গে আমৃত্যু যুক্ত ছিলেন শম্ভু মিত্র। তাঁর পরিচালনায় উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি হল নবান্ন, দশচক্র, রক্তকরবী, রাজা অয়দিপাউস ইত্যাদি। তাঁর রচিত নাটকের মধ্যে 'চাঁদ বণিকের পালা' সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ১৯৭৬ সালে নাটক ও সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য তাঁকে ম্যাগসেসে পুরস্কার ও ভারত সরকারের পদ্মভূষণ সম্মানে ভূষিত করা হয়।

শম্ভু মিত্রের জন্ম কলকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে মাতামহ ডা. আদিনাথ বসুর গৃহে। তাঁর পিতার নাম শরৎকুমার বসু ও মাতার নাম শতদলবাসিনী দেবী। শম্ভু মিত্রের পৈতৃক নিবাস ছিল হুগলি জেলার কলাছাড়া গ্রামে। বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট স্কুলে বিদ্যালয় শিক্ষা সমাপ্ত করে ভরতি হন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে। তবে কলেজের পাঠ সমাপ্ত করেননি। ১৯৩৯ সালে রংমহলে যোগদানের মাধ্যমে বাণিজ্যিক নাট্যমঞ্চে তাঁর পদার্পণ। পরে যোগ দিয়েছিলেন মিনার্ভায়। নাট্যনিকেতনে কালিন্দী নাটকে অভিনয়ের সূত্রে সে যুগের কিংবদন্তি নাট্যব্যক্তিত্ব শিশিরকুমার ভাদুড়ীর সঙ্গে আলাপ হয়। পরবর্তীকালে শিশিরকুমার ভাদুড়ীর প্রযোজনায় আলমগীর নাটকে অভিনয়ও করেছিলেন। কিন্তু এই সময় থেকেই শিশিরকুমারের থেকে আলাদা সম্পূর্ণ নিজস্ব এক নাট্যঘরানা তৈরিতে উদ্যোগী হন শম্ভু মিত্র। ১৯৪২ সালে ফ্যাসিবিরোধী সংঘের সঙ্গে পরিচিত হন শম্ভু মিত্র। ১৯৪৩ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক পি. সি. যোশির অনুপ্রেরণায় যোগ দেন ভারতীয় গণনাট্য সংঘে। ১৯৪৫ সালের ১০ ডিসেম্বর গণনাট্য সংঘে কাজ করার সময়ই প্রখ্যাত মঞ্চাভিনেত্রী তৃপ্তি মিত্রের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন শম্ভু মিত্র।

১৯৪৮ সালে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে গঠন করেন বহুরূপী নাট্যগোষ্ঠী। ১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বহুরূপীর প্রযোজনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সফোক্লিস, হেনরিক ইবসেন, তুলসী লাহিড়ী এবং অন্যান্য বিশিষ্ট নাট্যকারের রচনা তাঁর পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয়। তাঁর এই পরিচালনাগুলি ভারতীয় নাটকের ইতিহাসে এক একটি মাইলফলক হিসেবে পরিগণিত হয়। ১৯৭০ সালে একটি আর্ট কমপ্লেক্স নির্মাণে উদ্দেশ্যে গঠন করেন বঙ্গীয় নাট্যমঞ্চ সমিতি। অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সমিতির প্রযোজনায় ও অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় মঞ্চস্থ মুদ্রারাক্ষস নাটকে অভিনয়ও করেন। কিন্তু রাজ্য সরকারের অসহযোগিতায় প্রয়োজনীয় জমি না পাওয়া গেলে পরিকল্পনাটি পরিত্যক্ত হয়। ১৯৭৬ সালে নাটক ও সাহিত্যে বিশেষ অবদানের

জন্য ম্যাগসেসে পুরস্কার ও ভারত সরকারের পদ্মভূষণ সম্মান লাভ করেন। ১৯৭৭ সালে এক বছরের জন্য বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং ফেলো হয়েছিলেন। ১৯৭৮ সালের ১৬ জুন অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসে দশচক্র নাটকে অভিনয় করেন। বহুরূপীর প্রযোজনায় এটিই তাঁর শেষ নাটক। এই বছরই ১৫ আগস্ট আকাডেমিতে স্বরচিত চাঁদ বনিকের পালা নাটকটি পাঠ করেন তিনি। এরপর বহুরূপীর আর কোনো প্রযোজনায় তাঁকে দেখা যায়নি।

১৯৭৯ সালে প্রায় দৃষ্টিহীন অবস্থায় নান্দীকার প্রযোজিত 'মুদ্রারাক্ষস' নাটকে চাণক্যের ভূমিকায় তাঁর অভিনয় বিশেষ সাড়া ফেলেছিল। ১৯৮০-৮১ সালে ফ্রিৎজ বেনেভিৎজের পরিচালনায় ক্যালকাটা রিপোর্টারির প্রযোজনায় গ্যালিলিওর জীবন নাটকে অভিনয় করেন। ১৯৮৩ সালে নিজের প্রযোজনায় কন্যা শাঁওলী মিত্র পরিচালিত নাথবতী অনাথবৎ নাটকে কন্যার সঙ্গে অভিনয় করেন শম্ভু মিত্র। শাঁওলী মিত্রের পরবর্তী নাটক কথা অমৃতসমান-এর সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন শম্ভু মিত্র। কন্যার নাট্যসংস্থা পঞ্চম বৈদিকের প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য ও আমৃত্যু কর্মসমিতি সদস্য ছিলেন। ১৯৮৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রবীন্দ্রসদনে পঞ্চম বৈদিকের প্রযোজনায় ও তাঁর পরিচালনায় দশচক্র নাটকটির পরপর ছয়টি অভিনয় পাঁচ দিনে মঞ্চস্থ হয়। অভিনেতা রূপে এর পর আর কোনোদিন মঞ্চে অবতীর্ণ হননি তিনি। ১৯৮৩ সালে বিশ্বভারতী তাঁকে দেশিকোত্তম উপাধিতে সম্মানিত করে। যাদবপুর ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সাম্মানিক ডি.লিট. উপাধিতেও ভূষিত করেছিল। ১৯৯৭ সালের ১৯ মে কলকাতার বাসভবনে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন শম্ভু মিত্র। ইচ্ছাপত্র-এ তিনি লিখেছিলেন-

> "মোট কথা আমি সামান্য মানুষ, জীবনের অনেক জিনিস এড়িয়ে চলেছি, তাই মরবার পরেও আমার দেহটা যেন তেমনই নীরবে,

একটু ভদ্রতার সঙ্গে, সামান্য বেশে, বেশ একটু নির্লিপ্তির সঙ্গে গিয়ে পুড়ে যেতে পারে।" [১০]

এই কারণে সৎকার সমাধা হওয়ার পূর্বে সংবাদমাধ্যমে শম্ভু মিত্রের মৃত্যুসংবাদ প্রচার করা হয়নি।

বহুরূপীর প্রযোজনায় শম্ভু মিত্র পরিচালিত উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি হল: নবান্ন, 'বিভাব', ছেঁড়া তার, পথিক, দশচক্র, চার অধ্যায়, রক্তকরবী, পুতুল খেলা, মুক্তধারা, কাঞ্চনরঙ্গ, বিসর্জন, রাজা অয়দিপাউস, রাজা, বাকি ইতিহাস, পাগলা ঘোড়া, চোপ আদালত চলছে ইত্যাদি। চাঁদ বণিকের পালা তাঁর রচিত একটি কালজয়ী নাটক। এই নাটকের প্রযোজনা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবে একাধিক অনুষ্ঠানে তিনি এই নাটক পাঠ করেছেন এবং রেকর্ডও করেছেন। তাঁর রচিত অন্যান্য নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য: উলুখাগড়া, বিভাব, ঘূর্ণি, কাঞ্চনরঙ্গ ইত্যাদি। এছাড়া গর্ভবতী বর্তমান ও অতুলনীয় সংবাদ নামে দুটি একাঙ্ক নাটকও রচনা করেন। নাট্যরচনা ছাড়াও শম্ভু মিত্র পাঁচটি ছোটোগল্প ও একাধিক নাট্যবিষয়ক প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত কাকে বলে নাট্যকলা ও প্রসঙ্গ: নাট্য দুটি বিখ্যাত প্রবন্ধগ্রন্থ।

শম্ভু মিত্র ছিলেন বাংলার এক স্বনামধন্য আবৃত্তিশিল্পী। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের মধুবংশীর গলি কবিতাটি আবৃত্তি করে তিনি জনসমাজে বিশেষ সাড়া ফেলেছিলেন। রক্তকরবী, চার অধ্যায়, রাজা অয়দিপাউস, তাহার নামটি রঞ্জনা, ডাকঘর, চাঁদ বণিকের পালা ও অয়দিপাউসের গল্প তাঁর স্বকণ্ঠে রেকর্ড করা নাট্যপাঠ। এছাড়া শম্ভু মিত্র (কবিতা আবৃত্তি), রবীন্দ্রনাথের কবিতাপাঠ, দিনান্তের প্রণাম তাঁর প্রসিদ্ধ বাংলা কবিতা আবৃত্তির রেকর্ড। নাট্যাভিনয়ের সূত্রে চলচ্চিত্র জগতেও পা রেখেছিলেন শম্ভু মিত্র । খাজা আহমেদ আব্বাসের পরিচালনায় নির্মিত হিন্দি ছবি ধরতি কে লাল-এর সহকারী পরিচালক ছিলেন তিনি। অভিনয় করেছেন মানিক, শুভবিবাহ, ৪২, কাঞ্চনরঙ্গ,

পথিক, বউ-ঠাকুরাণীর হাট প্রভৃতি চলচ্চিত্রে। অমিত মিত্রের সঙ্গে একদিন রাত্রে ও তার হিন্দি জাগতে রহো-র কাহিনি, চিত্রনাট্য ও পরিচালনার কাজ করেন। রাজ কাপুর প্রয়োজিত ও অভিনীত জাগতে রহো ছবিটি গ্রাঁ পিঁ সম্মানে ভূষিত হয়েছিল।

শম্ভু মিত্র ও উৎপল দত্তের পরেই বাংলা থিয়েটারের জগতে পৌনঃপুনিকতা অনুসরণ ও বামপন্থী রাজনীতির প্রচার, বিদেশি নাটকের অবিকল করা এরকম এক স্থিতাবস্থায় প্রচণ্ড আঘাত করতে চেয়েছিলেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি নাটক নির্বাচনের জন্য বার বার ফিরে গেছেন বিদেশের নাট্যকারদের কাছে। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নাট্য জীবন শুরু করেন গণনাট্য সংঘের আওতায়, কিন্তু পরবর্তীকালে এই গণনাট্য ত্যাগ করে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন নান্দীকার নাট্যগোষ্ঠীর। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় অধুনা পুরুলিয়া তখন মানভূম। ১৯৩৩-এর ৩০ সেপ্টেম্বর সেখানকার রোপো গ্রামে মামাবাড়িতে জন্মান অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। বেশ কয়েক বছর পরে কলকাতায় পা রেখে তাঁর পরিবর্তিত নাম হয় অজিতেশ। পিতা ভুবনমোহন ও মাতা লক্ষ্মীরানির বড় ছেলে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। পিতা কোলিয়ারিতে কাজ করেন। আসানসোল শিল্পাঞ্চলের রামনগরে। একটু বড় হতেই অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় দেখলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। সেটা ১৯৪২, তখন তাঁর বয়স বছর নয়েক। জাপানি বোমার ভয়ে পিতা ভুবনমোহন তাঁকে পুরুলিয়ার ঝালদায় এক আত্মীয়ের বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। সেখানে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় তিনটি বিষয়ের প্রেমে পড়েছিলেন— ফুটবল, রাজনীতি এবং থিয়েটার। প্রথমটির ঘোর অল্প দিনের মধ্যেই কেটে যায়। দ্বিতীয়টিতে প্রভাবিত করে গান্ধীজীর লেখা। কিন্তু পরের দিকে কমিউনিজমের দিকে ঝুঁকেছিলেন। বেশ কিছু কাল সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ নিয়েছিলেন। তবে থিয়েটারের মগ্নতা আমৃত্যু কাটাতে পারেননি অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। ঝালদা থেকে বছর খানেকের মধ্যেই ফিরে এলেন রামনগরে। কুলটি স্কুলে পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি হলেন। অষ্টম শ্রেণিতে ওঠার পর পিতা ভুবনমোহনের বদলি হয় ঝরিয়ার কাছে চাসনালায়।

সেখানেই নাট্যগুরুর দেখা পেলেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। নাম প্রবোধবিকাশ চৌধুরী। তাঁর সঙ্গেই পাথরডি রেলওয়ে ইনস্টিটিউটে 'টিপু সুলতান'-এ জীবনের প্রথম অভিনয় করেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইংরেজির স্নাতক অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় শিক্ষক হিসেবে কাজে যোগ দিলেন। পাশাপাশি তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। বাগুইআটির হিন্দু বিদ্যাপীঠের ইংরেজির শিক্ষক, পার্টি কর্মী, তথা গণনাট্য সঙ্ঘ পাতিপুকুর শাখার শিল্পী অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে তখন সবাই এক ডাকে চেনেন। দমদম আঞ্চলিক কমিটির সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর দায়িত্ব পড়ে গণনাট্য সঙ্ঘের চারটি শাখাকে মিলিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রযোজনা তৈরি করার। মঞ্চস্থ হল 'সাঁওতাল বিদ্রোহ'। তার পর ধারাবাহিক ভাবে সঙ্ঘের কাজ করেছেন তিনি, মূলত থিয়েটারকে আঁকড়ে। প্রথম দিকে তারই শাখা হিসেবে কাজ করত 'নান্দীকার'। কিন্তু সঙ্ঘের সঙ্গে মানসিক দূরত্ব আর বিচ্ছিন্নতা বাড়তে থাকে। তাই গণনাট্য সঙ্ঘ থেকে সরে এসে ১৯৬০-এর ২৯ জুন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে, দীপেন্দ্র সেনগুপ্ত এবং অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহায়তায় স্বতন্ত্র সত্তায় আত্মপ্রকাশ করল 'নান্দীকার'। এর পর প্রায় ১৭ বছর এই সংগঠনের সঙ্গে থিয়েটারকে নিয়ে নিজেকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে নিয়েছিলেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই দলের প্রথম নাটক ইবসেনের 'ঘোস্টস'। বাংলায় 'বিদেহী'। একটি মাত্র অভিনয়ের পর বন্ধ হয়ে যায় এই নাটকের শো। '৬০-'৬১-তে পর পর কয়েকটি নাটক মঞ্চস্থ করে নান্দীকার। মৌলিক এবং বিদেশি নাটক নির্ভর 'দাও ফিরে সে অরণ্য', 'সেতুবন্ধন', 'চার অধ্যায়', 'প্রস্তাব' করার পর ১৯৬১ সালের ১২ নভেম্বর অভিনীত হল 'নাট্যকারের সন্ধানে ছ'টি চরিত্র'। এই নাটক বাংলা থিয়েটারে নান্দীকার-এর নাম দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। এর পর অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় একের পর এক মঞ্চসফল প্রযোজনা করেছে নান্দীকার। 'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী', 'যখন একা', 'নানা রঙের দিন', 'তিন পয়সার পালা', 'শের

আফগান', 'ভাল মানুষ'— তালিকায় নাম বাড়তেই থাকে। নির্দেশনার পাশাপাশি নাটকের গান তৈরি করা, সে গানের সুর দেওয়া, বিদেশি নাটকের আত্তীকরণ, মৌলিক নাটক লেখা— সবই চলতে থাকে অজিতেশের।

১৯৭৭-এ 'সাংগঠনিক কারণ'-এ নিজেরই তৈরি করা দল নান্দীকার ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই বছরের ৯ সেপ্টেম্বর তিনি গঠন করলেন নতুন সংস্থা, 'নান্দীমুখ'। প্রথম দিকে নান্দীকারে করা তাঁর পুরনো নাটকগুলিই মঞ্চস্থ করত নান্দীমুখ। 'নানা রঙের দিন', 'শের আফগান', 'তামাকু সেবনের অপকারিতা', 'প্রস্তাব' ইত্যাদি নাটক দিয়েই পথ চলতে থাকে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়র নতুন দল।

বিদেশে বসে লেখা, সে দেশের পটভূমিতে লেখা বিভিন্ন নাটক অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়র ছোঁয়ায় হয়ে উঠত ঘরের নাটক। এই বাংলার নাটক। ভিন্ন দেশ-কাল-পরিবেশ-পরিস্থিতি-পাত্রপাত্রী যেন হয়ে উঠত একান্ত ভাবেই এ দেশের। বা বলা ভালো, এই বঙ্গের। ব্রেখট, ইবসেন, চেখভ, পিরানদেল্লো, ওয়েস্কার, পিন্টার— বিশ্ব নাট্য জগতের এই সব স্থপতির সঙ্গে বাঙালির পরিচয় অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে। এঁদের নাটকের অনুবাদ নয়, বঙ্গীয়করণ করে তিনি উপস্থাপন করতেন মঞ্চে। অভিনয় শিল্পের সব ক'টি মাধ্যমেই কাজ করেছেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। মঞ্চ নাটকে তো তিনি অবিসংবাদিত অভিনেতা ছিলেনই, বাংলা চলচ্চিত্র এবং যাত্রাশিল্পও সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁর অভিনয়ে। বাংলা ও হিন্দি মিলিয়ে মোট ৬৩টি চলচ্চিত্রেও অভিনয় করেন। ১৯৮৩-র ১৩ অক্টোবর মাত্র পঞ্চাশ বছর বয়সে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান বাংলা অভিনয় জগতের প্রবাদপ্রতিম এই শিল্পী

বাংলা নাটকের জগতে যাঁরা বিদেশি নাট্য ফর্মের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন বাদল সরকার। তাঁরই হাতে প্রথম বাংলা অ্যাবসার্ড নাট্যধারার সূত্রপাত। নাট্যকার বক্তব্যকে স্পষ্ট করে দর্শকের কাছে পৌঁছে

দেবার চিন্তাধারা থেকেই থার্ড থিয়েটারের উদ্ভব। বাদল সরকার গড়ে তুলেছিলেন তার থার্ড থিয়েটার বা তৃতীয় থিয়েটার। লাতিন আমেরিকার তৃতীয় চলচ্চিত্র যেভাবে হলিউডি ছবিগুলিকে দূরে ঠেলে দিয়ে নিজেদের আদলে গড়ে তুলে, একান্তভাবেই নিজেদের অর্থাৎ লাতিনীয় হয়ে উঠেছিল, বাদল সরকারের তৃতীয় থিয়েটারও হয়ে উঠেছিল দেশীয়। তাঁর দেশীয় নাটক তাই সমাজের সকল শ্রেণির কাছে বোধগম্য হয়ে ওঠে। ষাটের দশকে আধুনিক নাট্যকার হিসেবে মারাঠি ভাষায় বিজয় টেন্ডুলকার, হিন্দিতে মোহন রাকেশ এবং কানাড়ি ভাষায় গিরিশ কার্নাডের পাশাপাশি বাংলায় বাদল সরকারের নামও উঠে আসে। এবং ইন্দ্রজিৎ, পাগলা ঘোড়া, সারারাত্তির, বাকি ইতিহাস সহ প্রায় পঞ্চাশটির মতো নাটক রচনা করেছেন। ১৯৭২ সালে তাঁকে পদ্মশ্রী পদক প্রদান করা হয়। ১৯৬৮ – তে সঙ্গীত নাটক একাডেমি অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয় এবং ১৯৯৭ সালে সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমি ফেলোশীপ থেকে ভারত সরকারের সর্ব্বোচ্চ সম্মানিত পুরষ্কার 'রত্ন সদস্য' পদকে তাঁকে ভূষিত করা হয়।

নাট্যকার বাদল সরকারের শিল্পজীবন শুরু হয়েছিল অভিনয় দিয়ে। ১৯৫১ সালে চক্র থিয়েটারের 'বড় তৃষ্ণা' নাটকের মধ্যে দিয়ে তার অভিনয় জীবন শুরু। সেই সময়ের পশ্চিম বঙ্গের থিয়েটারে শম্ভু মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য এবং উৎপল দত্তের মতো বিখ্যাত সব রিয়ালিস্ট নাটকের দিকপালেরা মঞ্চ কাঁপিয়ে নাটক নির্মাণ করে যাচ্ছেন। ১৯৬৩ সালে নাইজেরিয়া থাকাকালীন সময়েই তার জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক "এবং ইন্দ্রজিৎ" লিখে শেষ করেন, যা ১৯৬৫ সালে প্রথম মঞ্চস্থ হয় কলকাতায়। এর মাঝেই "চক্র" নামে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান করেন এবং নিয়মিত মঞ্চায়ন ছাড়াই নিয়মিতভাবে নাটকের ওপর আলোচনা,পড়াশোনা এবং রিহার্সাল চালিয়ে যান। ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত তিনি কর্মজীবন চালিয়ে গেলেও ১৯৭০ নাগাদ নাট্যকার হিসেবে তার পরিচিতির প্রসার ঘটতে থাকে। শুধু তাই নয়, তাকে শিক্ষামূলক এবং সামাজিক দায়বদ্ধ নাট্যকার হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। তার 'থার্ড থিয়েটার' সেরকম একটি

চেষ্টার ফল। মূলত যাত্রা এবং দেশীয় ঐতিহ্যের নির্যাস সম্বলিত ভাব থেকে নিয়ে তার এই থার্ড থিয়েটারের যাত্রা – যা একান্তই নিজস্ব। থার্ড থিয়েটারের উৎপত্তি সামন্ত সমাজের সেই গুটিকয়েক শিক্ষিতের দ্বারা, যারা ভূস্বামী বা কৃষক কোন শ্রেণির মধ্যে পড়ে না। বাদল সরকারের নাটকে কোন প্লট থাকে না। চরিত্রের সুনির্দিষ্ট কোন চরিত্রায়ণ নেই। অভিনেতা-অভিনেত্রীরা ইচ্ছে মতো চরিত্র বাছাই করতে পারে, নাটকের মাঝখানে চরিত্র বদলও করতে পারে, এমনকি দর্শকেরাও অভিনয়ে অংশগ্রহণ করতে পারে। এই অংশগ্রহণ ঠিক আক্ষরিক অর্থে নয়, এই অংশগ্রহণের অর্থ নাটকে তাদের সংশ্লিষ্টতা খুব জোরালো ভাবে থাকে। যেমন 'প্রস্তাব' নাটকের শেষে একটি দড়ির গিট খুলতে দেওয়া হয় দর্শকদের। অর্থাৎ নাটকের চরিত্ররা যেমন শারীরিক কষ্টের দ্বারা নাটক উপস্থাপন করেন, দর্শকরাও সেই কষ্টের কিছুটা অংশভাগী হোক। তার থার্ড থিয়েটারে মুখের অভিব্যক্তির চাইতে শারীরিক অভিব্যক্তি অধিক গুরুত্ব পায়। এখানে একটি কথা বলে রাখা ভালো, চলচ্চিত্রের বড় পর্দায় পারফরমার বা অভিনয় শিল্পীদের মুখের অভিব্যক্তি যতটা প্রয়োজন মঞ্চ নাটকে ততটা প্রয়োজন পড়ে না, আর তাই মঞ্চ নাটকে চরিত্রদের দেহের অভিব্যক্তি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। সরকারের নাটকে চরিত্রদের 'স্পেস' বা 'স্থানিক' স্বাধীনতা প্রচুর। ফলে চরিত্ররা ইচ্ছেমতো ঘুরে ফিরে অভিনয় করেন।

মণিপুরের একটি ওয়ার্কশপে সরকার মণিপুরি ভাষায় যে নাটক উপস্থাপন করেছিলেন সেখানকার স্টেজটি ছিলো উন্মুক্ত। শুধু ওপরে কিছু বাঁশের সারি দিয়ে ছাদ নির্মাণ করা হয়। মাটিতে ম্যাট বা চট বিছিয়ে দর্শকের বসার ব্যবস্থা করা হয়। নাটকের আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র সীমিত ব্যবহারের কারণে যে কোন জায়গায় যখন তখন তার নাটক মঞ্চায়িত হতে কোন অসুবিধা হতো না। নাটকের গঠন এবং সংলাপ পরিবেশনা কখনো কখনো অভিনয়ের মূল উপজীব্য হয়ে যায়। ছোট ছোট সংলাপ, দৃশ্য সহ ভঙ্গুর সংলাপগুলো কখনো কখনো অর্থহীন অ্যাবসার্ড নাটকের মতো হয়ে

ওঠে। কোন নাটকে দেখা যায় একই সংলাপ দুটো চরিত্রকে দিয়ে বলানো হয়েছে। আবার একই পারফরমার ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রে রূপদান করে। যেমন তার একটি নাটকে যখন দেখা যায় একই ব্যক্তি পিয়ন এবং বসের চরিত্রে অভিনয় করেন, তখন বাদল সরকার এই বিষয়ে বলেন এই দুইজনের মাঝে মূলত কোন পার্থক্য নেই, কারণ দুজনই মানুষ। কাজেই একই ব্যক্তি দুটো চরিত্রে অভিনয় করতে পারে। অর্থাৎ একই ব্যক্তির দুটো ভিন্ন শ্রেণির চরিত্র চিত্রায়নের মধ্যে দিয়ে তিনি এক ধরনের শ্রেণিহীন সমাজের উপস্থাপন করার চেষ্টা করেন।

দর্শককে সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করানোই বাদল সরকারের নাটকের বৈশিষ্ট। জীবনের মূল্য এবং সামাজিক সম্পর্কের টানাপোড়েন এমন একটি প্রতিকূল পরিবেশে এনে দেখান যেখানে দর্শককে বিস্ময়ের পর বিস্ময় জাগাতে থাকে। যেমন ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ নাটকে সুমন্ত ব্যানার্জি যদি ইন্দ্রজিৎকে প্রশ্ন করে মানুষ কেন বেঁচে থাকবে তাহলে ‘সারা রাত্রি’, ‘বাকি ইতিহাস’, ‘ত্রিংশ শতাব্দী’ এবং ‘শেষ নেই’ নাটকগুলোতে তিনি দেখান মানুষের বেঁচে থাকার ব্যর্থতা বা সার্থকতা একান্তভাবেই তার নিজের ওপর নির্ভর করে। অস্তিত্বের শূন্যতা পূরণে ব্যর্থতার কারণেই মানুষ অপরাধ বোধ করে। এবং সেখান থেকেই মানুষের বেঁচে থাকার অপরাধবোধ বা দায়িত্ববোধ শুরু হয়।

‘শেষ নেই’ (১৯৭০)’নাটকে দেখা যায় নাটকের মূল চরিত্র সুমন্ত জীবনের নানা পছন্দের মাঝে ঘুরে শেষ পর্যন্ত নিজেকে লেখক হিসেবে আবিষ্কার করেন। যে লেখক বড় একটি পুরস্কার পাবার পরে পরেই তার মা, শিক্ষক, প্রেয়সী, পার্টি কমরেড, তার শিক্ষক, অফিসের বস এর দ্বারা অভিযুক্ত হন। দেখা যায় তাদের অভিযোগের কোন অন্ত নেই। অথচ সে অখণ্ডতার পেছনেই ছুটেছিল। প্রেমিকা মানিকার সাথে তার ঘর বাঁধা হয়নি কারণ সুমন্তর আকাশটা ছিল বিশাল। সংসারের বদ্ধ ঘরে সে তার

জীবনকে গন্ডীবদ্ধ করতে চায়নি। বিপ্লব বন্ধু প্রশান্তকে ছাড়তে হয়, দুজনের মানসিক দূরত্বের কারণে। প্রশান্ত রাজনৈতিক দলের প্রতীক হয়ে আমাদের সামনে এসে দেখা দেয়। দুজন মানুষ কখনো একরকম হয় না। একরকম হলেও তাদের ভেতরকার মানসিক অভাব বোধটা থেকেই যায়। এই অভাব কেউ কাউকে দিয়ে পূরণ করতে পারে না। কাজেই সেখানেও সুমন্ত কোনো সমাধান খুঁজে পায় না। সুমন্ত পড়াশোনা করতে চায়নি, চেয়েছিলো শিখতে। লেখাপড়া করা আর শেখা এক বিষয় না। তাই এম.এস.সি. পাশ করার পর তার শিক্ষক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অমিয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের শত অনুরোধেও গবেষণামূলক কার্যক্রম থেকে নিজেকে বিরত রাখে। শ্রীবাস্তবের অধীনে জুনিয়র এক্সেকিউটিভ পদে মোটা বেতনের চাকরিও ছেড়ে দেয়। পুঁজিবাদের চক্রাকার প্রবাহ মানুষকে কীভাবে অর্থ-লোলুপ করে তোলে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে শ্রীবাস্তবকে মাত্র একটি সংলাপ দিয়ে সুমন্ত বলে – 'রক্তে ঘুণ ধরিয়ে দিয়েছিলেন আপনারা টাকা দিয়ে। টাকার অভ্যেস করিয়ে দেন আপনারা – ঐ আপনাদের পদ্ধতি।' আসলে সুমন্ত নিজের মতো করে বাঁচতে চেয়েছিলো। নিয়ম–নীতি, আইন–আদলত দিয়ে জীবনকে নিজের মতো করে সাজানো যায় না। তাইতো সুমন বলে ওঠে – 'আমি যেতে চাই যাওয়া ছাড়িয়ে।' এই যাওয়া ছড়িয়ে যাবার অভিপ্রায় নিয়ে বিভিন্ন পথ পরিক্রমের পর লেখক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেও শেষ রক্ষা করতে পারেনি। লেখক হিসেবে এখানেও তার একটা ফাঁক থেকে গেছে। সমাজের প্রান্তিক মানুষেরা সুমন্তকে অভিযুক্ত করে তাদের সম্পর্কে লেখার বিষয় নিয়ে। সুমন্ত ভয় পায় তাদের নিয়ে লিখতে। প্রান্তিকেরা জানায় – ভয় নিয়ে বাঁচা যায় না। ভয়ে মূল্যবোধ চলে যায়। আশা চলে যায়। জীবনের অর্থ চলে যায়। মন পঙ্গু হয়ে যায়। নাটকের শেষে আমরা এই উপলব্ধিতে আসি – কেউ যখন কোন আঘাত বা ভীতির মুখোমুখি হয় তখন একান্তভাবেই ব্যক্তির নিজ দায়িত্বে একা

তাকেই মোকাবিলা করতে হয়। নাটকের একেবারে শেষে তাই আসামী আর বিচারক একাকার হয়ে যায়। এভাবেই চলে নিজেকে নিরন্তর খুঁড়ে দেখা ও চলার ইতিহাস।

'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকটি শেকড়হীন নব্য শহুরে মধ্যবিত্তের কাহিনিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হওয়ায় তাঁর নাটক শহুরে মধ্যবিত্তের জন্যে রচিত বলে মনে হতে পারে। কিন্তু একটু নিবিষ্ট চিত্তে তাঁর সব নাটক পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায় তাঁর পৃথিবী দৈনন্দিন বাস্তবতাকে ঘিরে আবর্তিত, যে পৃথিবী অ-নায়কচিত। আর তাই সাধারণ দর্শকের প্রতিই তাঁর প্রাধান্য দেখা যায়। বাদল সরকার এই সাধারণ দর্শকদের উদ্দেশ্যেই বলেছিলেন এসব দর্শক যারা খুব ভালো পোশাক পরে নাটক দেখতে আসেন না তারা নাটকের ভেতর মূল বিষয়-বস্তুর দিকেই কেবল মনোযোগী, আর ভালো পোশাক পরিহিত তথা শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণি নাটকের ভেতর সৌন্দর্যশাস্ত্র বা নন্দনতত্ত্ব খুঁজে বেড়ান। তাঁর অন্য একটি নাটক 'ওরে বিহঙ্গ' আক্ষরিক ভাবেই সমাজের প্রান্তিক চরিত্রদের এনে, সমাজের প্রান্তিক চরিত্রগুলিকে কেন্দ্র করে নাটকটি নির্মিত হয়েছে। এই নাটক সমাজের যেকোনো শ্রেণি থেকে উঠে আসা দর্শকের কাছে বোধগম্য। মাত্র তিনটি চরিত্র – মোক্ষদা, রাজলক্ষী এবং পাগলদাদা। পাগলদাদা থিয়েটারের দল গড়তে চান নিম্নবিত্তদের নিয়ে। শুধু তা নয়, এই প্রান্তিক শ্রেণিকে অসম্ভবের সম্ভাবনা দেখাতে চান তিনি। নাটকের এক জায়গায়, পাগলদাদা তার নাটকের দলে যোগ দিতে আসা রাজলক্ষীকে জিজ্ঞেস করেন – 'সন্ধেরাতে আকাশেতে ছোট্টখাটো চাঁদ উঠলে তাকিয়ে দেখো? — আকাশ থেকে পেড়ে কামড়ে খেতে ইচ্ছে করে? — সন্ধেবেলা লালচে-নরম সূয্যিটাকে বল বানিয়ে খেলা করতে ইচ্ছে করে?' শুধু স্বপ্ন দেখা না, স্বপ্নকে জাগিয়ের রাখার এক যাদুকর যেন এই পাগল দাদা। কিন্তু বাস্তবতা বলে ভিন্ন কথা। নাটকের শেষে রাজলক্ষী তাই পাগল দাদাকে প্রশ্নে জর্জরিত করে – 'তোমার এটা থেটারের দল, না ওড়া শেখাবার ইস্কুল, বলতে পারো? ওড়া কি শেখানো যায়? শেখা যায়? মানুষ কি ওড়ে? মানুষ উড়লেও উড়তে পারে, কিন্তু মেয়ে

মানুষ? তাও যদি ওড়ে, বাসন-মাজা ঝি? বাসন মাজা ঝি কি পারবে – কখনো পারবে উড়তে?' তবু পাগল দাদার আশা লুপ্ত হয় না, হয় না তার স্বপ্ন দেখা আর স্বপ্নকে জাগিয়ে রাখার বাসনা।

শান্তি আর আনন্দ কখনোই পাশাপাশি বসবাস করতে পারেনা। শান্তি হলো গৃহকোণ আর আনন্দ হলো ভালোবাসা। সেই ভালোবাসা যা কারণহীন, যুক্তিহীন, বুদ্ধিহীন নির্বোধ এক একমুখী ভালোবাসা। এক সর্বত্যাগী, সর্বগ্রাসী, সর্বাঙ্গিক চাওয়া। একটা স্বপ্ন বা দুঃস্বপ্ন – যে স্বপ্ন রক্তমাংসের মানুষের মাঝে মেলেনা, কোনোদিন মিলবে না তার স্বপ্নের সঙ্গে। বাদল সরকারের অন্যতম আরেকটি নাটক 'সারারাত্তির' এভাবেই দর্শকের কাছে পৌঁছে দিতে চায় মানুষের গভীরে থাকা নিভৃত বাসনা। একটি মাত্র বৃষ্টির-রাতে সাত বছর একসঙ্গে বসবাস করেও স্বামী-স্ত্রী আবিষ্কার করে দুজনকে। শুধু ভালোবাসাই সব নয়। দুজন দুজনকে জানার মধ্যে দিয়েই গড়ে ওঠে প্রকৃত ভালোবাসা। অথচ এই জানার বিষয়টি ছাড়াই দুজন দুজনকে এতকাল ভালোবেসে এসেছে।

বাদল সরকার মানুষের হৃদয়ের অভ্যন্তরে নৃতাত্ত্বিকের মতো ফুঁড়ে বের করতে চান প্রকৃত মানুষটাকে। তাই দেখা যায় কোনো এক বৃষ্টি ভেজা রাতে দুই স্বামী-স্ত্রী একটা ভাঙ্গা বাড়িতে এসে হাজির হয় আশ্রয়ের জন্যে, যেখানে এক বৃদ্ধ অনেক কাল বসবাস করে এসেছে। নাট্যকার চমৎকার 'মেটাফোর' দিয়ে সাজিয়েছেন নাটকটি। বাড়িটা যেমন অদ্ভূত তেমনি অদ্ভূত সেই বৃদ্ধ। আরো অদ্ভূত সেই বৃদ্ধের সঙ্গে অদ্ভূতভাবে নারীর ভালোবাসা আর চাওয়া-পাওয়া একাকার হয়ে যায়। অন্ধকারে দুজনে এক হয়ে যায়। দুজনে যেন একটি অন্ধকার হয়ে হয়ে যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শান্তির জয় অনিবার্য। বৃদ্ধের একটি সংলাপে রয়েছে অতি বড় দুর্যোগেও ঘর ভেসে না যাওয়ার কথা। ঘর বাঁধা মানুষের এমনই এক চিরন্তন আর অনিবার্য এক অভ্যাস,

যে অভ্যাস থেকে মানুষ উঠে আসতে পারেনা। আর তাই ভোরের আলো ফুটে ওঠার আগে নারীকে অনিবার্য ভাবে স্বামীর সঙ্গে চলে যেতে হয়। পেছনে পড়ে থাকে একটি রাত, মাত্র একটি জেগে–থাকা রাত, অসম্ভব একটা ঘরে অসম্ভব একটা জেগে–থাকা রাত – যাকে শুধু স্মরণে থাকে গ্রহণ করা যায় না। এভাবেই বাদল সরকার তার নাটকের মধ্যে দিয়ে আমাদের অস্পষ্ট মুখাবয়ব স্পষ্ট করে তোলেন। জে.ভি. প্রসাদ মতে বলা যায়- বাদল সরকারের নাটকে সৃষ্ট উদ্বেগ দর্শক এবং মঞ্চের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টির চেয়ে দর্শকের সামনে অধিক জীবন্ত করে তোলে তাঁর নাটককে।

সাম্প্রতিক কালের প্রবাদ প্রতিম নাট্যকার হলেন মনোজ মিত্র। ১৯৭৭-এ যে নাটকের শুরু, ২০১৪-এও সেই বাঞ্ছারাম আবার মঞ্চে স্বমহিমায়। ২১ বছর বয়সে বঙ্কিম, ৩৭ বছরে গজমাধব (পরবাস) ৩৯ বছর বয়সে বাঞ্ছারাম (সাজানো বাগান) এই তিন বৃদ্ধ চরিত্রে অভিনয় রঙ্গমঞ্চে মিথ হয়ে গেছে অনেকটা। এখানে তিনিই অভিনেতা। আবার ১৯৭২-র নাটক চাকভাঙা মধু (প্রযোজনাঃ থিয়েটার ওয়ার্কশপ)-র জটা, মাতলা বা আরো পরের নাটক রাজদর্শন (প্রযোজনা- বহুরূপী) বা অন্য অনেক নাটকে বৃদ্ধ এক চরিত্র নিয়েই নাটক হয়ে ওঠে জীবনের এক অনুপম ভাষ্য। বৃদ্ধ হলেন বহুদর্শী। জীবনকে দেখেছেন তিনি বহুবছর ধরে। সেই দেখাই যেন তাঁর নাটকের দর্শন। যত বয়স বেড়েছে, বার্ধক্যের দিকে যত এগিয়েছে মানুষ, ত্রিকালদর্শী সেই চরিত্র হয়ে উঠেছে বার্ধক্যের কারণেই অনেকটা নিরূপায়। এই নিরূপায়তার গল্পই বলেছেন তিনি তাঁর নাটকে। 'মৃত্যুর চোখে জল'-এর বঙ্কিম বা 'পরবাসে'র গজমাধবকে মনে পড়ে। গজমাধব আমাদের নাট্য সাহিত্যে এক অদৃষ্ট-পূর্ব চরিত্র। কিন্তু যে বঙ্কিম একান্ত নিরূপায়, নিজের ওষুধের শিশি বোতল নিয়ে কোনোক্রমে বেঁচে থাকতে চায় যে, সে চাকভাঙা মধুতে এসে (জটা) বেঁচে থাকাকে একটু সহনীয় করে তুলতে নানা কৃতকৌশল অবলম্বন করে। শোধ নিতে চায় অঘোর ঘোষের মৃত্যু ঘটিয়ে দিয়ে। জোতদার অঘোর ঘোষ এসেছিল সাপের কামড় খেয়ে সেই তল্লাটের বড়

সাপের ওঝা মাতলার কুটিরে। নিয়ে এসেছিল তার পুত্র। মাতলার বুড়ো কাকা জটা শোধ নিতে চায়। অঘোর তাদের সব নিয়েছে। এবার যেন ফেরত নেবে। আসলে শ্রেণি চরিত্রের তফাতে জটা আর বঙ্কিম আলাদা হয়ে যায়। কিন্তু বেঁচে থাকার অদম্য বাসনা তাদের একই রকম। জটা মাতলা আর মাতলার গর্ভবতী মেয়ে বাদামী, এই তিনজনের শেষ দুজন চায় অঘোর বাঁচুক। জটা তার দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছিল আহত বিষধরকে বাঁচিয়ে রাখা মানে নিজেদের মরণ ডেকে আনা। বাঁচাব না মারব- এই দ্বন্দ্ব নিয়েই নাটক। বৃদ্ধ বঙ্কিম বাঁচত শিশি বোতল নিয়ে, জটার বাঁচা আর মরা যখন একাকার তখন সে শোধ নিয়ে বাঁচতে চায়। সে হল সুন্দরবনের হতভাগ্য ভূমিহীন, না খেতে পেয়ে চারপেয়ে হয়ে যাওয়া মানুষ। ফলে সে আর বঙ্কিম তো আলাদা হবেই। এরপর ১৯৭৫-এর নাটক পরবাস, সেখানে উচ্ছেদ হওয়া ভাড়াটে গজমাধব নানা কৃত-কৌশলে থেকে যেতে চায় তার বহুকালের পুরান আশ্রয়ে। এ নাটক তাই হয়ে ওঠে অসামান্য ব্যঞ্জনাময়। গজমাধবই যেন বাঞ্ছারাম হয়ে ওঠে সাজানো বাগানে। তার আগে বা পিছে লেখা কেনারাম বেচারাম হয়ে সাজানো বাগান। সাজানো বাগানের পর রাজদর্শন, কিনু কাহারের থেটার...কত নাটক। বেঁচে থাকার কৌশল আর অদম্য স্পৃহাই হয়ে ওঠে সমস্ত নাটকের মূলমন্ত্র। বেঁচে থাকার কথাই নানা ভাবে ঘুরে আসে। আর সেই বেঁচে থাকা এক ত্রিকালজ্ঞ বৃদ্ধের। তার বেঁচে থাকা শেষ অবধি যেন মানব সভ্যতার বেঁচে থাকা হয়ে ওঠে। সাজানো বাগান যেন সেই কথাই বলেছে শেষ পযর্ন্ত। বৃদ্ধের বেঁচে থাকা আর একটি শিশুর জন্ম সমার্থক হয়ে ওঠে।

মনোজ মিত্রের নাটক সাহিত্য পাঠের স্বাদ দেয়। তাঁর সংলাপে যেমন নাট্যগুণ তেমনি সাহিত্যের গুণ। রসবোধ অসামান্য। কাহিনির গভীরতা, নাট্য কাহিনিতে জীবনের অতল তল ছুঁয়ে যাওয়া, এসব আমাদের নাট্য সাহিত্যকে দিয়েছে এক বিরল মাত্রা। আবার যা নেই ভারতে বা চাকভাঙা মধু, সাজানো বাগান, অশ্বত্থামা। মনোজ

মিত্রের নাটকে সেই আস্বাদ পাওয়া যায়। অশ্বত্থামা নাটক তেমন অভিনয় না হয়েও এই নাটক উচ্চারিত হয় এর সাহিত্যগুণে।

মনোজ মিত্রের জীবনমুখী বক্তব্য, গভীর মানবিকতা, উন্নত কারুকার্য, নাটকের বিষয় ভঙ্গির বৈচিত্র্য সমসাময়িক নাট্যকারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। তিনি তাঁর নাটকের মধ্যে দুর্বল, অসহায়, অবহেলিত, পর্যুদস্ত মানুষের সংগ্রামের চিত্র ধরতে চেয়েছেন। শ্রেণি চরিত্রকে প্রাধান্য না দিয়ে মানুষকে নিয়ে আসেন ঘটনার কেন্দ্রে। মানুষের মধ্যে থাকা ভালো-মন্দ, জটিলতা–নীচতা, মহত্ত্ব-ঔদার্য ও ক্ষমা- নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি দুরূহ দ্বান্দ্বিক সমন্বয়কে তিনি নির্দিষ্ট কোনো ছাঁচে গড়ে তোলার চেষ্টা করেননি। অত্যাচার শোষণের বিরুদ্ধে শোষিতের জয় প্রতিষ্ঠা, ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে সত্য ও মানবিকতার প্রতিষ্ঠা, বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে ভালোবাসার প্রতিষ্ঠা এবং মৃত্যুর বিকল্পে জীবনের প্রতিষ্ঠা তাঁর নাটকে মূল প্রতিপাদ্য।

সমসাময়িক নাট্যকারদের অন্যতম মোহিত চট্টোপাধ্যায় তাঁর নাটকে মানুষের প্রতি সমাজের প্রতি গভীর আস্থা দেখিয়েছেন। তাঁর নাটক বিনোদনের জায়গা থেকে সরে এসে দর্শকের বুদ্ধিমত্তার কাছে আবেদন জাগায়। তাঁর নাট্য জীবনে প্রথম পর্যায় তিনি অদ্ভুতধর্মী নাটক রচনা করলেও মানবিক মূল্যবোধের দিকটি তিনি এড়িয়ে যাননি। একই সঙ্গে কবি ও নাটককার হওয়ার কারণে সংলাপের ভাষা কাব্য সুষমামণ্ডিত, সহজ-সরল, পরিশীলিত। একই সঙ্গে তিনি সাধু, চলিত, ইংরেজি, হিন্দি ভাষার ব্যবহার করেছেন তার সংলাপে। নাটকের বিষয়বস্তু, চরিত্র চিত্রণ, নাট্য আঙ্গিক প্রভৃতি বিষয়ে তিনি তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য নাট্যকারদের থেকে স্বতন্ত্র ছিলেন। তিনি তাঁর নাটকের সংলাপে ক্ষেত্রে একটা নাটকের জন্য অন্য একটা যুক্তির স্থাপনের মাধ্যমে বিষয়বিন্যাস, চরিত্র-চিত্রণ করেন। যেখানে অন্যান্য নাট্যকারগণ লোকের বোধের উপযোগী করে সহজ সড়ল ভাবে সাজাবার চেষ্টা করেন। ফলে স্বাভাবিক

ভাবে একটা সংলাপের পর যে সংলাপ হওয়া উচিৎ তিনি তা না করে অপ্রত্যাশিত ঘটনা, সংলাপের অবতারণা করেছেন। যা একই সঙ্গে নাট্য নির্দেশক, অভিনেতার পাশাপাশি দর্শকদের কাছেও খুবই চ্যালেঞ্জিং বিষয় হয়ে ওঠে। অবশ্য বিভিন্ন বিষয়কে চুলচেরা বিশ্লেষণ করার অসাধারণ দক্ষতা ছিল নাটককার মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের। তাঁর নাটকের সংলাপ বিন্যাসে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখার উৎস ব্যক্তি মোহিতের জাদুকরী বাকপটুতার মধ্যেই নিহিত ছিল। অনন্য সাধারণ রসবোধের দ্বারা জারিত করে শ্রোতাদের মোহময় জালে অনায়াসে বেঁধে ফেলতেন তিনি। এখানেই তাঁর প্রতিভার অনন্যতা-স্বাতন্ত্র্য-উজ্জ্বলতা-সার্থকতা।

তথ্যসূত্র

১। ভট্টাচার্য; সাধন – নাটকের রূপ রীতি ও প্রয়োগ, ১ম প্রকাশ- ১লা বৈশাখ ১৩৬৯; জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা-৯ ; পৃ-৬৭।

২। বন্দ্যোপাধ্যায়; পরিতোষ – নাট্যাভিনয় উপক্রমণিকা, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০০৪; প্যাপিরাস, কলকাতা -৭০০০০৪ ; পৃ -১১০।

৩। সেন; অতুল চন্দ্র , বিদ্যাভূষণ; সীতানাথ, ঘোষ; মহেশ চন্দ্র (অনূদিত ও সম্পাদিত) – উপনিষদ , অখণ্ড সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০০০, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা-৭০০০০৭।

৪। ভট্টাচার্য; সাধন – নাটকের রূপ রীতি ও প্রয়োগ, ১ম প্রকাশ- ১লা বৈশাখ ১৩৬৯; জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা-৯ ; পৃ-৯।

৫। তদেব।

৬। চট্টোপাধ্যায়; মোহিত – নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ, প্রথম প্রকাশ- বইমেলা, জানুয়ারি ২০০৬, নাট্যচিন্তা ফাউণ্ডেশন, কলকাতা-৭০০০১৪; পৃ-২৭।

৭। ঘোষ, জগন্নাথ – রবীন্দ্রোত্তর বাংলা নাটকের ইতিহাস, ১ম প্রকাশ বইমেলা ২০০৯, প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃ -১৭২।

৮। গোস্বামী, ড. সনাতন(সম্পাদিত)- তুলসী লাহিড়ীর নাট্য সমগ্র, ১ম প্রকাশ বইমেলা ২০১২, প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা- ৭০০০০৯ , পৃ- ১৬ (ভূমিকা অংশ)।

৯। ঘোষ, ড. অজিতকুমার- বাংলা নাটকের ইতিহাস, জানুয়ারি ২০০৫, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা -৭০০০৭৩, পৃ- ৪০৮-০৯।

১০। মিত্র, শাঁওলী : শম্ভু মিত্র ১৯১৭-১৯৯৫ বিচিত্র জীবনকথা, ২০১২, আকাদেমি, নিউ দিল্লী-৭০০০০১, পৃষ্ঠা -৫৭৪।